সাতদিন

৩০ আগস্ট : মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কাজী আরেফ আহমেদসহ পাঁচ জাসদ নেতা হত্যা মামলায় ১০ জনের ফাঁসি ও ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

৩১ আগস্ট : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৩ সালের শেষ ছয় মাসে সরকারের বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে ২২৫ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

১ সেপ্টেম্বর : দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় ২ পুলিশের ফাঁসি কার্যকর। গ্রেনেড হামলা তদন্তে ঢাকায় এফবিআই কর্মকর্তার আগমন।

শিবির ক্যাডারদের হাতে সিলেটের ভেটেনারি কলেজের ছাত্রদল নেতা খুন।

২ সেপ্টেম্বর : টিভি চ্যানেল ও পত্রিকার ছবি দেখে গ্রেনেড হামলায় সন্দেহভাজন ২০ জনের তালিকা তৈরি করা হয়।

টাংগুয়ার হাওর এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৩ সেপ্টেম্বর : রাশিয়ার উত্তর ওশোটিয়া প্রজাতন্ত্রের বাসলাম শহরের একটি স্কুলে জিম্মি উদ্ধার অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। অভিযানে ৩০০ জন নিহত ৬৫০ জন আহত।

৪ সেপ্টেম্বর : সাভারে নির্যাতিত গৃহবধূর শারীরিক অবস্থার অবনতি। ঢাকায় বিক্ষোভ, মানববন্ধন।

৫ সেপ্টেম্বর : সিলেটের মলাইটিলার 'ডাক্তার কলোনি'তে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত ও ৪ শিশুসহ ৭ জন আহত।

গ্রেনেড হামলা

কী তদন্ত হচ্ছে

আওয়ামী লীগের জনসভায় ২১ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণে তদন্তের কার্যত তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। দেশী-বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চলছে তদন্ত তদন্ত খেলা। গত সংখ্যায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে এ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল। তদন্তের নামে সবাই ব্যস্ত হয়েছিল। তদন্তের নামে সবাই ব্যস্ত আহতদের বক্তব্য গ্রহণে। গ্রেনেড হামলার নেপথ্যের রহস্য উন্মোচনের জন্য বিরাজমান কারণগুলোর প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই। তারা খতিয়ে দেখছে না বিগত বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত কারা। '৭৫-এর ঘাতকচক্রের গতিবিধি কি? বিভিন্ন মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে এ হামলার সম্পর্ক রয়েছে কি না। ভারতের বিদ্রোহী সাত রাজ্যের জঙ্গি সংগঠনগুলোর এ দেশে তৎপরতা। সরকারের ভেতর সরকার, আওয়ামী লীগের ভেতরে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম। কার্যত তদন্তের কারণের চেয়ে উপকারণগুলোই মুখ্য হয়ে উঠছে। ইন্টারপোল, এফবিআই তদন্ত থেকেও কোনো ক্লু বের হয়ে আসছে না। কৌশলে সরকার আওয়ামী লীগের ওপর দোষ চাপাতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ বলছে সরকারের অধীনে কোনো তদন্তই তারা মানে না। এফবিআই তদন্ত নিয়ে ইসলামী মৌলবাদী দলগুলো দিচ্ছে সতর্ক প্রতিক্রিয়া। সিলেটে ৫ সেপ্টেম্বর বোমা বিস্ফোরণে জনগণ আরো শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তদন্তের মহাযজ্ঞের মধ্যেও বোমাবাজদের কার্যক্রম থেমে নেই, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

বোমা হামলার ঘটনা তদন্তে হঠাৎ ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) প্রতিনিধি ঢাকায় আসেন। গ্রেনেড হামলার তদন্ত করতে আসেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাউন্টার টেরোরিজম গোয়েন্দা গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর অ্যাম্বাসেডর জে কফার ব্ল্যাক। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। তারা তদন্ত করছে নিজস্ব পদ্ধতিতে।

এদিকে ঐ গ্রেনেড হামলা তদন্তে হঠাৎ করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই'র আগমনে দেশবাসীর মনে নতুন করে সংশয় সৃষ্টি করেছে। এফবিআই তাদের দেশের অপরাধ শনাক্তকরণে অনেক উন্নত টেকনিকের অধিকারী হলেও দেশের রাজনৈতিক হত্যা মামলার ঘটনায় এ দেশের পুলিশের মতোই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির হত্যা চেষ্টার পেছনের নায়কদের তারা খুঁজে বের করতে পারেনি। নাইন ইলেভেনের ক্ষেত্রেও তাই। তাছাড়া ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার তদন্তে সরকার এফবিআই'র কোনো সাহায্য চেয়েছিল বলে জানা যায়নি। তারা নিজেরাই ঐ তদন্তের কাজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসেছে। সরকার আগে এ বিষয়ে কিছু না জানলেও পরে এটা মেনে নিয়েছে। কিন্তু তাদের এই আসা নিয়ে যে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাতে সমস্ত তদন্ত প্রক্রিয়াই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এফবিআই'র পর এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা বিশেষজ্ঞ জে কফার ব্ল্যাক। তিনি ঐ গ্রেনেড হামলার ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করছেন। তার এই সফর সমস্ত

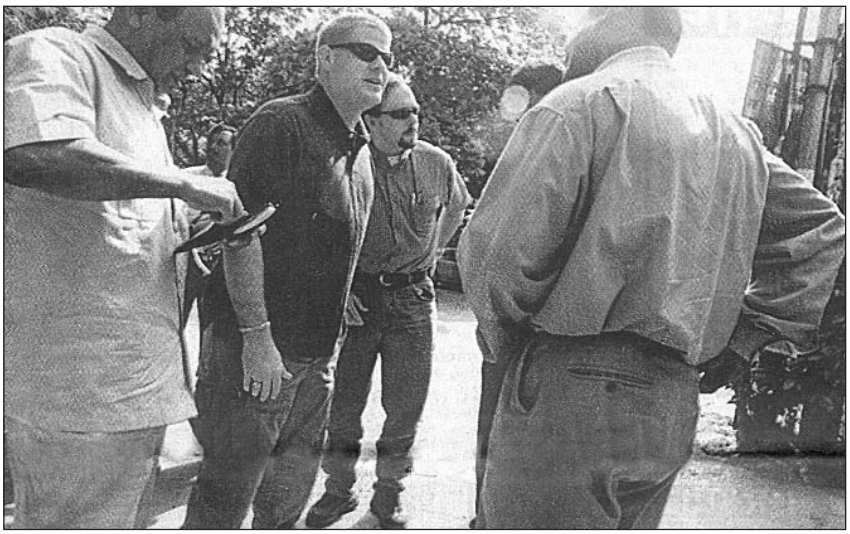

GdweAvB Ges B›Uvi‡cvj-Gi †M‡q›`vivI †b‡g‡Qb Z`‡š

তদন্ত প্রক্রিয়ায় আর একটি মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের ইসলামিক দলগুলো বিদেশী গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের ঢাকা আগমনকে খুশি মনে মেনে নিতে পারেনি। তারা বলেছে, কেউ যদি এ ধরনের বোমাবাজি ও গ্রেনেড হামলার অজুহাতে বাংলাদেশকে ইরাক অথবা আফগানিস্তান বানাতে চায়, তবে তারা ভুল করবে। প্রয়োজনে এই তদন্তকারীদের তারা লাঠিপেটা করবে। ফলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী দলগুলোর পক্ষ থেকে তদন্তে বাধা দেয়া হচ্ছে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো প্রকার তদন্তই শেষ পরিণতি নেবে বলে মনে হচ্ছে না। তদন্ত রিপোর্ট যদি প্রকাশও করে, তারপরও সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণেই রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহল প্রথম থেকেই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এমন একটি তদন্ত কমিশন গঠন করতে বলেছিলো। সরকারের তরফ থেকে যদি সে ব্যাপারে বিরোধী দলের কাছে পরামর্শ চাওয়া হতো, তাহলে তারা না করতে পারতো না। পুলিশি তদন্তের ব্যাপারেও একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করা যেত। বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রাণনাশ হতে পারে এ ধরনের একটি ঘটনা তদন্তের জন্য প্রথমে একজন এসআইকে নিয়োগ করা হয়। পরে ঐ মামলা আরও দু'দফা হাতবদল হয়। আর যে পুলিশ এই তদন্ত করবে তার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই যে ধরনের মনোভাব নিয়ে আছেন তাতে ঐ পুলিশি তদন্ত সম্পর্কেই প্রশ্ন এসে যায়। জানা যায়, পুলিশের আইজি অথবা ঢাকার পুলিশ কমিশনার কেউ অকুস্থল পরিদর্শন করা জরুরি মনে করেনি। সেই পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বহাল রেখে ঐ গ্রেনেড হামলায় যে উপযুক্ত তদন্ত হবে তা আশা করা যায় না।

অপরদিকে ইন্টারপোল প্রতিনিধিরা আসার পর দেশী গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের গতি থেমে গেছে। তারা শুধু এখন ইন্টারপোলকেই সহযোগিতা করছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির তদন্তেও নেই তেমন অগ্রগতি। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের তদন্ত থেমে গেছে।

আসলে গ্রেনেড হামলার নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন বিগত বোমা হামলার মোটিভ অনুসন্ধান করা এবং এ বোমা হামলার তদন্ত রিপোর্টগুলো পর্যালোচনা করা। এ যাবৎ ১৪টি বড় ধরনের বোমা, গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটেছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে মাত্র তিনটির। এ বোমা, গ্রেনেড হামলার পর গ্রেপ্তারকারীরা কি জবানবন্দি দিয়েছিল তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। দেশে এখন প্রায় ১৫টি মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন সক্রিয়। এমন সংগঠনের সঙ্গে রয়েছে দেশী এ বিদেশী বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপের সম্পর্ক। সিলেটে বারবার বোমা বিস্ফোরণের পর এসব জঙ্গি সংগঠনের নাম উঠে আসছে। গ্রেনেড বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে এ বিষয়টিকে কার্যত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। গুরুত্বের মধ্যে আসছে না '৭৫-এর ঘাতকদের সন্ত্রাসী চক্র কে।

সেভেন সিস্টার নামে পরিচিত ভারতের বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। ভারত সরকার প্রায়ই বলে আসছে বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে প্রায় ৭০টি বিদ্রোহীর ক্যাম্প রয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে এ ক্যাম্পগুলো কিছুটা খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি বিরোধীদলীয় নেত্রী ভারত সফর করে এসেছেন। এ গ্রুপটি এ সফরকে ভালোভাবে নেয়নি।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো একমত, আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে একটি সশস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রুপ। তারা ২০-২৫ জন ছিল। কয়েকটি ভাগে তদন্তে এ সশস্ত্র গ্রুপটি কোথা থেকে গ্রেনেড পেয়েছে, কারা তাদের গ্রেনেড দিয়েছে তা তদন্ত করতে হবে। গৌণ কারণে মুখ্য করে তদন্ত ফলদায়ক হবে না। এ দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলার মতো বর্বর ঘটনা নিয়ে তদন্ত তদন্ত খেলা দেখতে চায় না। তারা চায় তদন্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাক। বোমা হামলার প্রকৃত ঘটনার দ্বার হোক উন্মোচিত। এ গ্রেনেড হামলার রহস্য আমরা যদি উন্মোচন করতে না পারি তাহলে ঘাতকেরা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তদন্তের নামে বিদেশী শক্তি আগ্রাসন সৃষ্টির সুযোগ পাবে। যা আমাদের অন্ধকার এক ভবিষ্যতের দিকেই নিয়ে যাবে।

জয়ন্ত আচার্য ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে একটি সশস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রুপ। তারা ২০-২৫ জন ছিল। কয়েকটি ভাগে তদন্তে এ সশস্ত্র গ্রুপটি কোথা থেকে গ্রেনেড পেয়েছে, কারা তাদের গ্রেনেড দিয়েছে তা তদন্ত করতে হবে

ফলোআপ

মুসা কিডন্যাপ করেছিল নজরুলকে

সম্প্রতি সাপ্তাহিক ২০০০-এ 'X-ফাইল : আদম ব্যাপারী মুসা বিন শমসেরের প্রতারণা' শিরোনামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। এই রিপোর্টে লেখা হয়েছিল তার এক সময়ের ডানহাত এবং সাম্প্রতিক সব অপকর্মের সাক্ষী নজরুল ইসলাম গত ২৫ জুন থেকে উধাও। দু'মাসেরও অধিক সময় নিখোঁজ থাকায় নজরুলের পরিবারসহ সবাই মনে করেছিল মুসা তাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু গত ৪ সেপ্টেম্বর নজরুল র‍্যাব-৪-এর কাছে ধরা দিয়ে নিরাপত্তা চায় এবং মুসার অপকর্মের কিছু নথিপত্র র‍্যাবকে দেখায়। নজরুলের স্ত্রী মাহমুদা বেগম সাপ্তাহিক ২০০০কে জানিয়েছেন, তার স্বামী অজ্ঞাত স্থান থেকে একই দিন তাকে ফোন করে জানায়, মুসা তাকে কিডন্যাপ করে এতো দিন আটকে রেখেছিল। সুযোগ পেয়ে সে পালিয়ে এসে র‍্যাবের কাছে ধরা দিয়েছে। র‍্যাব ফোরের সিও কমান্ডার সাবের শরিফ ২০০০কে বলেছেন, 'বিষয়টি আমরা সিরিয়াসলি তদন্ত করছি, তাই এখন কিছু বলতে চাইছি না।'

উল্লেখ্য, মুসা বিন শমসের বিদেশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ২ সহস্রাধিক লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের আর বিদেশে পাঠাননি। এভাবে তিনি প্রায় ৪৫ কোটি টাকা হাতিয়েছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এ রিপোর্ট হওয়ার পর মুসার সাব এজেন্ট লিটনের নেতৃত্বে একদল লোক তার অফিসে গিয়ে হামলা চালায়। তারা লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে মুসাকে মারধর করে বলে জানা যায়। এরপর থেকে মুসা আর অফিসে আসেন না। তবে বিক্ষুব্ধ লিটন গ্রুপের দেয়া টাকা ফিরিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিকে অন্য পাওনাদাররাও জোট বাঁধছেন মুসাকে শায়েস্তা করে টাকা আদায়ের জন্য।

বদরুল আলম নাবিল

কানাইঘাট : সিলেট

অন্ধকারের জনপদ

এখানে মাইক বাজানো যাবে না। কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করা যাবে না। কোনো নির্বাচনে কোনো মহিলা এখানে প্রার্থী হতে পারবেন না। আর যদি কোনো মহিলা প্রার্থী হন, তবে পোস্টার করলেও ছবি ছাপাতে পারবেন না। এই নিয়মনীতি যেখানে, সেখানে আজ প্রগতি, সংস্কৃতি গেছে নির্বাসনে। নির্বাচনে সেখানে নারী আছে অবরোধবাসিনী হয়ে। সেই এলাকার নাম কানাইঘাট। সিলেটের সীমান্তবর্তী এক উপজেলা। এখানে মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মোল্লাতন্ত্রের তেজ আছে। কিন্তু গণতন্ত্রের নামগন্ধ নেই।

সিলেট থেকে বাসযোগে এ সড়কপথে যাবার সময় দেখা যাবে, বাসে করে যে মহিলারা যাচ্ছেন, কানাইঘাটের আশপাশে যে মহিলারা আসা-যাওয়া করছেন তাদের একজনও বোরখা ছাড়া নেই। কারণ এ এলাকায় বোরখা ছাড়া চলাফেরা করা নাজায়েজ। তবে কানাইঘাটের এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পায়ে হেঁটে যাবার ক্ষেত্রে মহিলারা বোরখার সঙ্গে ছাতাও ব্যবহার করেন। আর তা শুধু বর্ষা নয়, সব ঋতুতেই।

সম্প্রতি কানাইঘাট সড়কের বাজার ও এর আশপাশের গ্রামে গেলে জানা যায় কানাইঘাটের মোল্লাদের দাপটের নানা কথা। সড়কের বাজারে কানাইঘাটের এমন সংস্কৃতির ব্যাপারে বলতে গিয়ে ব্যবসায়ী মোঃ সুনাই মিয়া বলেন, আমাদের কানাইঘাটের ৯ ইউনিয়নের এমন কোনো গ্রাম পড়বে না যেখানে মাইক বাজে, নারীরা ছাতা ও বোরখা ছাড়া চলাফেরা করে। কারণ এই নিয়মের বাইরে গেলেই মাওলানারা ক্ষেপে যান।

জানা গেছে, গেল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এখানে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিলেও তারা পোস্টারে তাদের ছবি ছাপাতে পারেননি। কারণ পোস্টারে ছবি ছাপানো ইসলামবিরোধী কাজ। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া এক মহিলা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমরা আমাদের ছবি ছাপতে চেয়েছি। কিন্তু মাওলানা সাহেবরা ক্ষেপে গিয়ে যদি কোনো ফতোয়া দেন এই ভয়ে পোস্টারে ছবি ছাপাতে পারিনি। এমন অভিযোগ করে গত ইউপি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া একাধিক মহিলা জানান, তারা নির্বাচন করেছেন ঠিকই কিন্তু মাওলানারা প্রচার করেছেন মহিলাদের ভোট দেয়া হারাম। তাই মহিলা প্রার্থীদের তেমন ভোট পাননি। মহিলারা জানান, এই মোল্লাতন্ত্র ভাঙতে এখন কানাইঘাটে সবার সহযোগিতায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, না হলে আমাদের মুক্তি মিলবে না।

সিলেটের সীমান্তবর্তী কানাইঘাট উপজেলায় রয়েছে অসংখ্য মাদ্রাসা। এসব মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে মাওলানাদের আধিপত্য দিনে দিনে বেড়ে উঠছে গোটা উপজেলায়। গ্রামের পর গ্রামে মাওলানাদের প্রভাব থাকায় পুরো এলাকায় যেন কায়েম হচ্ছে মোল্লাতন্ত্র। সিলেটের বহুল আলোচিত মাওলানা হাবিবুর রহমানের অনুসারীদের বিরাট অংশ থাকে কানাইঘাটেই। মাওলানা হাবিব সিলেটে কোনো সমাবেশ করতে গেলে তাদের গাড়িযোগে সিলেটে এনে নামান। জানা গেছে, কানাইঘাটের বিভিন্ন এলাকার মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে রেখে হাবিবের অনুসারীরা স্থানীয় লোকজনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। এ ব্যাপারে আলাপকালে সিলেটের বিতর্কিত মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। এই ধর্মের বিধান মেনে চলার ব্যাপারে আমার ও আমার মতো অনেক মাওলানার অনুসারীরা কানাইঘাটে সক্রিয় রয়েছে।

সিলেট থেকে **সৌমিক আজাদ**

আমিনীর হুমকি

ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান সাংসদ মুফতি ফজলুল হক আমিনী হুমকি দিয়েছেন আগামী ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রকাশক, সম্পাদক ও সাংবাদিকরা নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে দেশের কোথাও ১৬ সেপ্টেম্বরের পর সাপ্তাহিক ২০০০ বিক্রি করতে দেয়া হবে না। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের মহাসাবেশ থেকে ঘোষণা করা হবে কঠোর কর্মসূচি। গত ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার কক্সবাজার পাবলিক হল মাঠে 'কওমি মাদ্রাসা সংরক্ষণ পরিষদ' আয়োজিত মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন আমিনী। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০, প্রথম আলো এবং জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে কওমি মাদ্রাসা সংক্রান্ত রিপোর্টের কড়া সমালোচনা করে কাদিয়ানি, ইহুদি এবং পশ্চিমবঙ্গের 'দালাল' বলে আখ্যায়িত করেন। সাপ্তাহিক ২০০০ কাদিয়ানি এবং ইহুদিদের টাকা খেয়ে এ রিপোর্ট করেছে। 'কওমি মাদ্রাসা : জঙ্গি তৈরির কারখানা'- এই রিপোর্টের ছবিগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি, বানোয়াট এবং কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ করেন তিনি।

পরিষদের কক্সবাজার জেলা সহসভাপতি মওলানা সোলাইমানের সভাপতিত্বে এ মহাসমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুফতি এজহারুল ইসলাম চৌধুরী, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব এবং চট্টগ্রামের লালখান বাজার মাদ্রাসার পরিচালক মুফতি এজহার। তারা এই সুযোগে ঐক্য জোরদারের কথা বলেন। না হয়, এ চক্রান্তকারী সাপ্তাহিক ২০০০-এর কর্তৃপক্ষ কাদিয়ানি ও ইহুদিদের অর্থে ইসলামের আরো ক্ষতি করে ফেলবে।

'টুপি'তে বরকত আছে। 'টুপি'ওয়ালারাই এ দেশ শাসন করবে- অন্যরা নয়।'

হাটহাজারী মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ আবদুল হক বলেন, 'ইহুদিদের দোসর ও কাদিয়ানিদের দালাল এ সাংবাদিকদের পিঠের চামড়া তুলে নিতে হবে।'

বিএনপির সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী বলেন, 'উখিয়া-টেকনাফ থেকে চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। আমি কোথাও জঙ্গি ট্রেনিং হচ্ছে শুনিনি।' আরেক সাংসদ সহিদুজ্জামান বলেন, 'সাপ্তাহিক ২০০০ কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে লিখে জঘন্য অপরাধ করেছে।' বান্দরবান, খাগড়াছড়িসহ প্রত্যন্ত জনপদ থেকে প্রায় ৪০,০০০ জঙ্গির এ সমাবেশ দেখে উপস্থিত একজন মন্তব্য করেন- দাতা সংস্থার অনুদান, শিশু পাচার, হুন্ডি ব্যবসা ছাড়া এই জমায়েতের অর্থ কোত্থেকে আসে?

প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখের সংখ্যায় যশোর থেকে জনৈক মামুন রহমানের বরাত দিয়ে 'ভুনা মাংসে ক্যান্সার এইডস সারে!! ছুটছেন লাখ লাখ মানুষ!! শিরোনামে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনের একটি অংশের ব্যাখ্যা দিয়েছেন মতিউর রহমান নিজামী। 'প্রতিবেদনে কথিত নূর আহাদের কাছে আমি লোক পাঠিয়ে দাওয়াই এনেছি বলে পরিবেশিত তথ্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ প্রসঙ্গে আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, 'কথিত নূর আহাদের কাছে দাওয়াই আনার জন্য আমি কাউকে পাঠাইনি এমনকি আমার পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকেও ঐ ব্যক্তির কাছে কাউকে পাঠানো হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমি কিংবা আমার পরিবারের সদস্যগণ এ ধরনের দাওয়াইতে বিশ্বাস করি না'।